# আনন্দবাজার পত্রিকা

# তিনিই কি ছিলেন সিধু জ্যাঠা?

শান্তভানু সেন

০৬/০৩/২০২০

—ফাইল চিত্র।

শহর কলকাতার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি গৌরবময় বিগত যুগের সার্থক প্রতিনিধি বলা যেতে পারে নির্মলচন্দ্র কুমারকে। শতবর্ষ পূর্ণ হয়ে গিয়েছে তাঁর। ১৯৭৬ সালে প্রয়াত নির্মলচন্দ্রের কলকাতার সংস্কৃতিতে কী অবদান, তা বলতে গেলে তখনকার বাঙালি সমাজ কত আলাদা ছিল, তা-ও আর এক বার মনে করিয়ে দেওয়া যায়।

নির্মলচন্দ্র কলকাতা শহরের বুকে পুরনো বইয়ের আশ্চর্য সংগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন ১৯৪০ সালে। শিল্পকলা, পর্যটন, পক্ষিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, ইতিহাস, সাহিত্য, পর্বতারোহণ থেকে ধর্ম, ভারততত্ত্ব— কী ছিল না তাঁর লাইব্রেরিতে! আর ছিল অজস্র গল্প-উপন্যাস। শহরের বহু শিক্ষিত মানুষের কাছে এক অমোঘ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই সংগ্রহ। সত্যজিৎ রায়, কমলকুমার মজুমদার, শান্তি চৌধুরী

(ভারতে প্রথম তথ্যচিত্র নির্মাতা), নিখিল সরকার (শ্রীপান্থ), রঘুবীর সিংহ, মারি সিটন, এন জে নানপুরিয়া, মুলকরাজ আনন্দ, নির্মলেন্দু চৌধুরী, অশোক মিত্র (ভারতীয় জনগণনার পুরোধা), সুভো ঠাকুর, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত— নির্মলচন্দ্রের সংগ্রহশালায় অতিথির তালিকা চোখধাঁধানো।

১৯৪০-এর দশকের প্রথম দিকে কলকাতা শহরে পুরনো বই এক রকম দুষ্প্রাপ্য ছিল। বিখ্যাত পুরনো বইয়ের দোকান ক্যামব্রে, যা স্যর আশুতোষকে বহু বই সরবরাহ করেছিল, তখন অস্তাচলের পথে। থ্যাকার ও স্পিঙ্ক-এর দোকান চালু ছিল বটে, কিন্তু দুষ্প্রাপ্য বই সেখানে খুব কমই পাওয়া যেত। পুরনো বই খুঁজতে হলে একমাত্র গন্তব্য ছিল কলেজ স্ট্রিট চত্বর। নির্মলচন্দ্র তাঁর নিজস্ব বই, মানচিত্র, পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য সামগ্রীর পসরা সাজিয়েছিলেন এন্টালিতে তাঁর নিজেরই বাড়িতে।

প্রথম জীবনে নির্মলচন্দ্র বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছেন, লেখালিখিও করেছেন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মুখ দেখেননি— তাঁর নিজের ভাষায় বললে, নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পরে তিনি ঝুঁকলেন দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহের কাজে। তাঁকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন ইয়াকুব নামক এক মুসলমান ব্যবসায়ী, যিনি নিজে ছিলেন নিরক্ষর।

মুলকরাজ আনন্দ লিখছেন, 'কুমার ও তাঁর বন্ধুবান্ধবের দৌলতে ১৯৫০-এর দশকে তাঁর বাড়িটি বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনস্থল হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে আপনি ভেসে বেড়াতে পারেন চিত্র থেকে গ্রাফিক্সে, প্রথম দিকের প্রিন্ট থেকে মানচিত্রে, পৌঁছতে পারেন সমারসেট–এ, এবং সেখান থেকে হেঁটে হুগলি নদী— তার পরে নৌকায় চড়তে পারেন নীল নদে।'

সত্যজিৎ রায় যখন 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' তৈরি করছেন সিপাই বিদ্রোহের পটভূমিতে, তাঁর ভরসা নির্মলচন্দ্রের গ্রন্থাগার। নির্মলচন্দ্র সত্যজিৎকে শুধুমাত্র দুষ্প্রাপ্য বই সরবরাহ করেননি, লন্ডনের নিলাম থেকে বহু মূল্যবান নথিও জোগাড় করে দিয়েছিলেন। সত্যজিৎ বারংবার নির্মলচন্দ্রের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত ছিলেন নিয়মিত অতিথি। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, সত্যজিতের ফেলুদার গল্পে যে সিধু জ্যাঠার বর্ণনা পাওয়া যায়— তাঁর সঙ্গে নির্মলচন্দ্রের সাদৃশ্য রয়েছে। নির্মল কুমারের গ্রন্থাগারে ভিড় করতেন চলচ্চিত্র নির্মাতা, সঙ্গীতজ্ঞ, সাহিত্যিক, পুস্তকপ্রেমী নানা ধরনের মানুষ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জঁ রেনোয়া, যামিনী রায়, রিচার্ড বার্টন (চলচ্চিত্র অভিনেতা নন, পর্যটক), আনন্দ কুমারস্বামী, স্যর অরিয়েল স্টেন। এই আড্ডায় বাড়তি আকর্ষণ ছিল নির্মলচন্দ্রের নিজের হাতের রান্নার স্বর্গীয় আস্বাদ। রাধাপ্রসাদ লিখছেন, আরব্য রজনীর খানদানি খাবারের কথা মনে পড়ে যেত।

বিশিষ্ট পর্যটক এবং এশিয়া বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ইলা মাইলার্ট অনেক বার নির্মলচন্দ্রের সংগ্রহশালায় এসেছিলেন। তাঁর মতে, নির্মলচন্দ্রের বাড়িতে আসা মানে তীর্থদর্শন— সারা দিন বইয়ের পাতা উল্টে যাওয়া, বিভিন্ন বিষয়ে নির্মলবাবুর সঙ্গে সজীব আলোচনা, সঙ্গে অনির্বচনীয় খাওয়াদাওয়া। নির্মলচন্দ্রের সম্ভ্রান্ত উদাসীন আভিজাত্য অতিথিদের মুগ্ধ করত।

ফরাসি কোটিপতি ও শিল্প সম্রাট জঁ রিব্যু, যিনি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইঝিকে বিয়ে করেছিলেন, তিনি কলকাতায় এলেই নির্মলচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে দেখা করতেন, ফরাসি বইপত্র ঘেঁটে দেখতেন। সেই সব বই নির্মলচন্দ্র সংগ্রহ করেছিলেন চন্দননগর থেকে। নির্মলচন্দ্রই প্রথম ভারতীয়, যিনি তাঁর সংগ্রহের ক্যাটালগ প্রকাশ করেন অনেকটা প্রাচীন ব্রিটিশ ঘরানায়। জুয়োলজিক্যাল গার্ডেনে হিমালয়ের পাখির বিষয়ে ও বন্যপ্রাণীর উপরে বহু দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহের পিছনে প্রধান অবদান নির্মলবাবুর। নির্মলচন্দ্র আর একটি জিনিস চালু করেছিলেন— তাঁর বইয়ের দোকানে বসেই বই পড়া। তখনকার কলকাতায় এই ব্যাপারটার মধ্যে একটা নতুনত্ব ছিল। ঠাসবুনোট গম্ভীর পরিবেশ সেখানে ছিল না।

১৯৭৫ সালের শেষ দিক থেকে কলকাতা শহরে দুষ্প্রাপ্য বইয়ের ব্যবসা একেবারে বাজারসর্বস্ব হয়ে যায়। বিভিন্ন মূল্যবান বই আলাদা করে ছিঁড়ে বিক্রি করাও শুরু হয়। নির্মলচন্দ্র তাঁর জীবনের হেমন্তপর্বে এই পণ্যবাণিজ্যশাসিত প্রবণতার সঙ্গে আপস করতে রাজি ছিলেন না। কাঞ্চন কৌলীন্যের উন্মাদনা থেকে দূরে থাকতেই তিনি পছন্দ করতেন। নিজের কক্ষপথে অবিচল নির্মলচন্দ্র ছিলেন তাঁর নৈতিক অবস্থানে সুস্থিত— তিনি চেয়েছিলেন বুকের ভিতর জ্বলতে থাকা বাতিটিকে সযত্নে আগলে রাখতে।

*প্রতীচী ইনস্টিটিউট, শান্তিনিকেতন*